Journal of Social Science and Humanities, Vol.7, No.2, 2025 Print ISSN: 1811-1564
https://doi.org/10.59738/jssh.v7i2.79 e- ISSN: 3136-2109

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

Journal of Social Science and Humanities (JSSH)

Uncertainty Regarding Access to Justice for Rural People: The Perspective of Salish and Village Courts

Sanjida Mostafiz*
School of Social Sciences, Humanities and Languages, Bangladesh Open University

Abstract

Rural people in Bangladesh face various obstacles in the justice system, from the primary justice system to the formal level, such as arbitration. Although the establishment of the rule of law is an expected aspect of a modern state system, the suffering of ordinary people at various stages of the legal process is endless. And the level of suffering is even greater among rural people. Ordinary people in villages are accustomed to the informal justice system in this country. The article highlights why people resort to rural arbitration or, in particular, which of the informal and formal justice systems do rural people feel more comfortable with, what kind of obstacles they face in accessing justice and how much understanding rural people have about the conventional justice system. At the same time, the purpose of this article is to analyze the context of what obstacles arise in the access of rural people to justice in arbitration and rural courts and how these obstacles can be overcome to ensure access to justice for rural people.

Keywords: *Informal justice, Village Court, Arbitration, Obstacles to justice, Justice.*

গ্রামীণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা: প্রেক্ষিত সালিশ ও গ্রাম আদালত

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ বিচার ব্যবস্থায় সালিশ ব্যবস্থার মত প্রাথমিক বিচার ব্যবস্থা থেকে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানান ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি প্রত্যাশিত বিষয় হলেও আইনি প্রক্রিয়ায় বিভিন্নধাপে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। আর গ্রামীণ জনগণের কাছে এ ভোগান্তির মাত্র আরো বেশি। এদেশে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় গ্রামের সাধারণ মানুষ অভ্যস্থ। কেন মানুষ গ্রামীণ সালিশের দ্বারস্থ হয় কিংবা বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক কোন বিচার ব্যবস্থায় গ্রামীন জনগণ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয় এবং গ্রামীণ জনগণ প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কতটুকু ধারণা রাখে উক্ত প্রবন্ধে তা তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে সালিশ ও গ্রামীণ আদালতে গ্রামীণ জনগণের বিচার প্রাপ্তির বিষয়গুলোতে কোন কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় এবং এসকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে গ্রামীণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: *অনানুষ্ঠানিক বিচার, গ্রাম আদালত, সালিশ, বিচারে প্রতিবন্ধকতা, ন্যায়বিচার।*

ভূমিকা

বাংলাদেশের নাগরিকদের আইনের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তিনটি স্তরে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এর মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম আদালত, জেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত এবং রাজধানীতে উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ গ্রামীণ সমাজে বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কানুন ও বিচার ব্যবস্থা অধিকাংশই ব্রিটিশ আইন কানুনের আদলে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অঞ্চলের জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, সংস্কৃতি, ধর্মসহ প্রায় সব কিছুই ব্রিটিশদের থেকে পৃথক। যে কারণে ব্রিটিশদের আদলে তৈরি এ বিচার ব্যবস্থা সকল শ্রেণীর জন্য কল্যাণকর হয়নি। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিষয়টি আরও প্রতিবন্ধকতা

*Corresponding author: Sanjida Mostafiz. E-mail: sanjida@bou.ac.bd
Journal homepage: https://jssh.bou.ac.bd

তৈরি করে। গ্রামীণ জনগণ আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় গিয়ে উকিল, আদালতের কর্মচারি, দালাল প্রমুখ ব্যক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দীর্ঘমেয়াদি বিচার ব্যবস্থার কারণে এ দেশে আদালতের রায় পেতে বাদী-বিবাদী উভয়েরই আর্থিক ক্ষতি হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক এ চাপ তাদেরকে আরও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। দীর্ঘ মেয়াদে মামলা পরিচালনা করে যাওয়ার বিষয়টিও তাদের জন্য একটা সমস্যা। বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণের কাছে জেলা শহরে উপস্থিত হয়ে আদালতে মামলা পরিচালনা বা মামলার খরচ চালানোর মত অবস্থা থাকে না। অনেক ছোটখাট বিষয়ে মামলা করার সুযোগ না থাকার কারণে দায়রা জজ আদালতে সেসব মামলা দায়ের করতে পারে না। এভাবে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই সুষ্ঠু ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বন্দ্ব ও বিবাদ প্রতিটি সমাজের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এসব বিবাদের মধ্য দিয়ে কোন একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক ভাবে গ্রামীণ সমাজে সালিশি প্রথা প্রচলিত আছে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। যা ঐতিহ্যবাহী অনানুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার একটা নিদর্শন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় দরিদ্র, নিরক্ষর, সংখ্যালঘু ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকে। এসব সমস্যার সমাধানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার বিচার ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত। সমাজে সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরেক শ্রেণীর মানুষকে সুবিধা বঞ্চিত করে রাখছে। এ ধরণের প্রেক্ষাপটে সমাজে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মত সীমিত সম্পদ ও অধিক জনগোষ্ঠীর দেশে এ ধরণের পরিস্থিতিতে অপরাধের তীব্রতা আরও প্রকট (Jansen, 1986)। ২০০০ সালের শুরু থেকে এ দেশে মোট মামলার ৯০ ভাগই ছিল জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা। দরিদ্র জনগণের জমি কেড়ে নেয়ার মনোভাব সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সমাজে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিচার প্রত্যাশী হয়। তারা শুরুতে গ্রামের মূখ্য ব্যক্তিদের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। এ সব ব্যক্তিরা গ্রামীণ সমাজে মাতবর নামে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের এসব মাতবরদের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ থাকে (রহমান, ১৯৮৬)। বিচারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই তারা পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। গ্রামের অসহায় জনগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রহসনমূলক বিচার মেনে নেয় বা আদালতের বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়। গ্রামীণ সমাজে বিচার প্রার্থীর পাশে বর্তমানে ব্রাক, ব্লাস্ট, নাগরিক উদ্যোগ, আরডিআরএস নামে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাহায্য দিচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামে মাতবরের রায়ের বিরুদ্ধে গেলে বা আদালতের দ্বারস্থ হলে সামাজিক ভাবে তাকে আরও হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। (Alim & Ali, 2007)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী মাতবরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশায় বিবাদী হিসেবে আদালতে প্রতিকার চায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সমাজে একত্রে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ আর্থিক, সামাজিক নানান ক্ষতির সম্মুখিন হয়। ব্যক্তি কোন ধরণের ক্ষতির শিকার হলে সমাজ বা রাষ্ট্র তা নিরসনে উদ্যোগী হয়। ব্যক্তি অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে (Alim, 2004)। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরনের বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশে সালিশ ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত (Alim & Ali, 2007; মহিউদ্দীন, ১৯৯৯)। সালিশ ব্যবস্থা যাদের জন্য প্রচলিত তাদের অধিকাংশই হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ। গ্রামীণ জনগণ তাদের বিচার প্রাপ্তির প্রাথমিক ধাপ হিসেবে সালিশ ব্যবস্থাতেই অভ্যস্থ (Siddiqi, 2003)। তবে বর্তমানে বিভিন্ন কারণে তারা সালিশ ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে আনুষ্ঠানিক বিচারের দিকে ঝুঁকছে। তবে সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায় আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার তেমন কোন সুফলও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী পায়না (Anderson, 2003)। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সকল শ্রেণীর মানুষ আইনের চোখে সমান (কামাল, ১৯৯৪)। সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান সুবিধা প্রাপ্ত হবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার বিচারের শরণাপন্ন হন। সালিশ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনিবার্য বিষয় হলেও বিভিন্ন কারণে তা ব্যহত হচ্ছে। প্রচলিত এ ধরনের বিচার ব্যবস্থায় কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতার ক্ষেএগুলো কী ও কিভাবে তা কাজ করে এসব তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামীণ জনগণ বিচার ব্যবস্থার সুফল নিতে গিয়ে কোন কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হচ্ছে তা সঠিক গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে এ গবেষণার যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা রয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে এসব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি বলে এ গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা নির্ধারিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু গৌণ গবেষণা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসকল গবেষণা আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার জন্য করা হয়েছে অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেখানে অনুদ্য থেকে গেছে। আইনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন গবেষণা হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থার ধরণ বিষয়ক পর্যালোচনায় প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে উৎস হিসেবে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, অভিসন্দর্ভ, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, দৈনিক পত্রিকা প্রভৃতি হতে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে উপস্থাপনের পূর্বে তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ইতিহাস লিখন পদ্ধতির আলোকে যাচাই করা হয়েছে। গৌণ উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে এ গবেষণায় ব্যবহৃত সেসব তথ্যগুলোকে বিভিন্ন উৎসের সাথে যাচাই করে প্রয়োগ করা হয়েছে। অনুমাননির্ভর তথ্য ব্যবহার, অপ্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র, অপূর্ণাঙ্গ বর্ণনার বিষয়গুলোর যাতে গবেষণায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সমাজ বা রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার পাওয়া মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। সাধারণ গ্রামীণ জনগণ এ অধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে তা নিয়ে গবেষণা খুবই অপ্রতুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইনী জটিলতা কি সেসব নিয়ে গবেষণার প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। গ্রামীণ জনগণের জন্য অনানুষ্ঠানিক গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা কিংবা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনি জটিলতাসমূহ কি তা নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। তবে গ্রামীণ জনগণ অনানুষ্ঠানিক সালিশ বা আনুষ্ঠানিক আদালত ব্যবস্থা পর্যন্ত কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন সে বিষয়ে গবেষণা অপেক্ষাকৃত কম। কিছু গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত কিছু বিষয় তুলে আনা হয়েছে। স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে বিচার ব্যবস্থায় দায়বদ্ধতার মত বিষয়গুলো থাকেনা বলে গ্রামীণ গরীব জনগণের উপর এর বেশ প্রভাব পড়ে বলে Michael Anderson মনে করেন। পুলিশের নির্যাতনে সবচেয়ে বেশি শিকার হন গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা। তার মতে, বিচার ব্যবস্থার সাথে দারিদ্রতার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বাজার ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রসারের জন্য আইনের শাসন প্রয়োজন বলে তার গবেষণায় উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবকে তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে দায়ী বলে মনে করেন (Anderson, 2003)। অন্যদিকে পশ্চিমাদের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলে মনে করেন ফেরদৌস জাহান। এ ব্যবস্থা যে কারণে দরিদ্রদেরকে আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এর মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফৌজদারি আদালতের প্রয়োজনীয় আইনগুলো অনেক পুরানো বলে সমস্যার উদ্রেক ঘটায়। তাছাড়া বিচার বিভাগের সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংযোগ, বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের নিম্ন গুণগতমান, দুর্নীতি, জনবলের অভাব এসব সমস্যাও বিদ্যমান। একই সাথে তিনি অনানুষ্ঠানিক গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থায় আইন বিষয়ে সচেতনতার অভাব, লিঙ্গীয় বৈষম্য, দুর্নীতি, ক্ষমতা ও অর্থের প্রভাবকেও দায়ী বলে মনে করেন (Ferdous Jahan: Undated)। আব্দুল আলিম এর মতে, আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাও রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে নেই তেমন কোন আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রশাসন। গ্রামের দরিদ্র মানুষের বিচারে সালিশ মূখ্য ভূমিকা পালন করে। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এখানে বিচারকের ভূমিকায় থাকলেও তারা পক্ষপাতমূলক রায় প্রদান করে। একারণে কিছু প্রতিষ্ঠান সবাইকে একত্রিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে (Abdul Alim, 2004)। লিনা হ্যাসেল গ্রামের দরিদ্র্য নারীদের বিচারের অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কোন শ্রেণীর নারীরা আসেন, কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে বা সে প্রতিষ্ঠান হতে কি সমাধান দেয়া হয় তা নিয়ে তাঁর গবেষণায় আলোচনা করেন (Lena Hasle, 2003)। তারিক ওমর আলী ও আব্দুল আলীম তাদের গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন, গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থার প্রতি কেন গ্রামের জনগণ এখনও আগ্রহী এবং অনেকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির দিকে আসলেও কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় সালিশ ব্যবস্থার মধ্যেই আস্থা খুঁজে পায়। সেসাথে কিছু বিষয়ে তারা সরাসরি কোর্টের কাছে গিয়ে বিচার দাবি করে (Alim & Ali, 2007)। দিনা সিদ্দিক তাঁর গবেষণায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক বিচার পদ্ধতির প্রতি আগ্রহী না হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া তাঁর গবেষণায় গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা, এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি নিয়ে পর্যালোচনা করেন (Siddiqi, 2003)। প্রাসঙ্গিক এসব গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় গ্রামীণ জনগণের কাছে সালিশ ব্যবস্থায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও গ্রামীণ সমাজের সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে ও সমস্যা নিরসণে এ ব্যবস্থা এখনও বেশ কার্যকর। অনেক

ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মত স্বল্পন্নোত দেশগুলোতে অধিকাংশ আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা গ্রামের দরিদ্র জনগণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক না এবং একই সাথে তা মানবাধিকারের পরিপন্থি।

গ্রামীণ সালিশের ধরণ

সাধারণত পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি বা পরিবার কিংবা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বা তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি বা পরিবারের মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। বিরোধের মাত্রা বেশি হলে বা ক্ষতির পরিমান বেশি হলে যখন নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না তখন সালিশের মাধ্যমের সমাধানের চেষ্টা করে। স্থানীয় সম্মানিত কোন ব্যক্তি বা গ্রামের মাতবর বা গ্রামের প্রধান হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে বিচার পরিচালনা করা হয় (Karim, 1990)। সালিশের বিষয় নির্ধারিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লোকজন যোগদান করে। নির্দিষ্ট তারিখে সালিশকারীদের সময় অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে সবাই উপস্থিত হয়। সালিশকারীদের অথবা অভিযুক্তদের বাড়ির উঠানে বা মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র বিশেষে আশেপাশের বাড়ির প্রাঙ্গণে বা যেখানে সালিশকারীদের সুবিধা মনে হয় সেখানেও সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের কিছু সাধারণ জনগণ তাতে অংশ নেয়। সালিশ সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজের নিয়মকানুন মেনে অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন অনুসারে নেয়া হয়। অনেক সময় একটি ঘটনায় কয়েকটি সালিশও প্রয়োজন হয় বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে। সালিশের ধরণের উপর সালিশের রায় নির্ভর করে। ক্ষমা চাওয়া, ক্ষতিপূরণ, নারী ঘটিত বিষয়ে বিয়ে করা, একঘরে করার মত বিষয়গুলো রায় হিসেবে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালিশের রায় চ্যালেঞ্জের মত দুঃসাহস কেউ করে না। তবে বিচার্য বিষয় সালিশকারীদের আয়ত্বের বাইরে হলে বিষয়টি গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়। অথবা রায় কেউ না মানলে তারা গ্রাম আদালতে বা জেলা পর্যায়ের আদালতে যেতে পারে।

গ্রামীণ জনগণের আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনীহা

প্রাচীন কালে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ। তবে বর্তমান সময়ে মানুষ রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে থাকে তাই উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা, দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ সমাধানে আইনগত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় যার মধ্য দিয়ে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮৬ হাজারের বেশি গ্রামের এ দেশে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও সামাজিক বিবাদ সমাধানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরণের বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত। অনানুষ্ঠানিক বিচার পদ্ধতির মধ্যে সালিশ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। একই সাথে অনানুষ্ঠানিক বা আধা-অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি নামে একটি পদ্ধতি প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সমঝোতা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। উপমহাদেশে প্রাচীন কাল হতে বিচার ব্যবস্থা অনেকটা গ্রাম আদালতের উপরই গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনগনের শান্তি শৃঙ্খলা, জান-মালের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সেটাকে বুঝানো হয়। তবে গ্রামের জনগণ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকারের বিচারই গ্রহণ করে। শুরুতে তারা আনুষ্ঠানিকের চেয়ে অনানুষ্ঠানিক বিচার পদ্ধতি গ্রহণে বেশি আগ্রহী হয়। তবে যে কোন পদ্ধতিতেই গ্রামীণ জনগন বিচার প্রত্যাশা করে না কেন সেখানেই তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার মধ্যে গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়। গ্রামীণ সামাজিক দ্বন্দ্ব সমাধানে সালিশ একটি ঐতিহাসিক প্রথা হিসেবে কাজ করে (Akand, 2003; Hasle, 2003)। সালিশ একটি প্রথাগত পদ্ধতি হিসেবে সমাজে প্রচলিত। মূলত গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের সংহতি রক্ষায় সালিশ বিশেষ ভূমিকা রাখে। একই সাথে গ্রামীণ বিরোধ, সংঘাত, অসহযোগীতা ও বিরুদ্ধবাদিতা মীমাংসা বা সমাধানের প্রধান উপায় হলো সালিশ (মহিউদ্দিন, ১৯৯৯)। গ্রামে আনুষ্ঠানিক কোন বিচারিক প্রতিষ্ঠান নেই বলে সালিশ ব্যবস্থাটিকেই গ্রামীণ সমাজে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে (Abdul Alim, 2004)। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা পারিবারিক বিরোধ, প্রতিবেশিদের সাথে জমি সংক্রান্ত বা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধসহ বেআইনি বা অনৈতিক আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ের কিছু প্রভাবশলী মানুষ সমস্যা সমাধান করে (Golub, 2003)। মূলত সালিশ সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সামাজিক আচরণ, ধর্মীয় বিষয় ও নৈতিকতা একটি কৌশল। সালিশ এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সমাজের নেতারা বিভিন্ন সমস্যা জানার পর সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে এর কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। এমনকি সালিশকে গ্রামের মধ্যেই দ্বন্দ্ব নিরসন ও গ্রামীণ প্রভাবশালীদের ক্ষমতা চর্চার জায়গা বলেও অনেকে অভিহিত করেন (Karim, 1990)। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোন পক্ষ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা বিবাদে জড়িয়ে পড়লে প্রাথমিক বিচারের জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারের কাছে না গিয়ে সালিশ ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়।

যে কারণে দেশে দুই তৃতীয়াংশ বিচার আনুষ্ঠানিক বিচারের আওতায় আসে না। সালিশ ব্যবস্থা গ্রহণীয় হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে তাদের নিজস্ব স্থানে বিচার বসে, সীমিত ব্যয় হয়, সাক্ষী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উপস্থিত থাকে ও সাক্ষীর খুব বেশি প্রয়োজনও হয়না যেহেতু ঘটনা সম্পর্কে সকলেই অবহিত থাকে। এ বিচার ব্যবস্থায় দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টি দেখা যায়। গ্রামীণ জনগণের অনেক ক্ষেত্রে লোকবলও কম থাকে বলে এ ব্যবস্থাকে তারা বেশি প্রাধান্য দেয়। যেহেতু আনুষ্ঠানিক আদালতসমূহের (নিম্ন আদালতসমূহ) অবস্থান জেলা সদরে তাই সদরে গিয়ে আদালতে বিচার চাওয়া অনেকের কাছে অচেনা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। তাছাড়া আদালতের বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা থাকেনা বলে তারা আদালতের শরনাপন্ন হতে চায় না (Alim & Ali, 2007)।

আনুষ্ঠানিক বিচার পরিচালনায় অনেক খরচের প্রয়োজন যা গ্রামের অনেকের কাছে থাকে না। সাক্ষীর সাক্ষ্য বা গুরুত্বপূর্ণ আলামত ছাড়া কেউ আদালত হতে ন্যায় বিচার পেতে পারে না। তাছাড়া প্রমাণ সংগ্রহ, আলামত সংরক্ষণের বিষয়গুলো বেশ জটিল প্রক্রিয়া। সেসাথে মামলার রায় কবে হবে, রায় পক্ষে না বিপক্ষে যাবে সে বিষয়গুলোও অজানা থাকে। তাছাড়া আদালতের অনেক কিছুই তারা বুঝতে পারেন না যেখানে সালিশে স্থানীয় ভাষায় বিচার হয় বলে সবকিছু বুঝতে পারা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়। বিচার ব্যবস্থার অরাজকতায় ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অপেশাদারিত্বের শিকার গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে দেখেও তারা আগ্রহী হয় না আনুষ্ঠানিক আদালতের দ্বারস্থ হতে। তাছাড়া গ্রামীণ সমাজে আদালতে মামলা পরিচালনার বিষয়টিতে ভালো ভাবে মেনে নেয় না বা সম্মানহানীকর অবস্থা রূপে বিবেচিত করে। যে কারণে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় তাদের আগ্রহ কম।

সালিশ ব্যবস্থায় অরাজকতা

গ্রামীণ জীবনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের সাথে সালিশ ব্যবস্থা জড়িত হয়ে আছে। তবে এ ব্যবস্থারও বেশ কিছু প্রতিবন্ধতা রয়েছে। গ্রামীণ প্রভাবশালীদের আত্মীয় বা সুসম্পর্ক থাকা ব্যক্তিরা সালিশে প্রভাব বিস্তার করে। দরিদ্র কেউ প্রতিপক্ষ হলে সালিশে প্রভাবশালীরা দরিদ্রদের বিপক্ষে রায়ের চেষ্টা করে (অ্যারেন্স এবং ব্যুরদেন, ১৯৮৫)। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সালিশকারী যেকোন মূল্যে তার আত্মীয় বা পরিচিত জনের পক্ষে রায় দেয়ার চেষ্টা করে (Alim & Ali, 2007)। ধনী কোন ব্যক্তি বা কৃষকের কোন সালিশে গ্রামে প্রভাবশালী সালিশকারীরা তার পক্ষেই বিচার করে কেননা তারা সেখানে শ্রেণী বন্ধুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে (মহিউদ্দীন, ১৯৯৯)। গ্রামে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের বিষয়টি গ্রামীণ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতা কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এটি একটি অসম সম্পর্ক বৈশিষ্ট্যগত দিক হতে, আধিপত্যের দিক থেকে বা আনুগত্যের দিক হতে। এখানে একজন উচ্চ মর্যাদার দাতা অন্যজন নিম্ন মর্যাদার গ্রহীতা। তারা উভয়েই বিভিন্ন ধরনের সুবিধা একে অপরকে প্রদান করে যদিও ধরণ ভিন্ন থাকে। তাদের সম্পর্ক মূলত সহযোগীতার যা গ্রামের জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এটি সীমিত সম্পদে প্রবেশের একটি উপায় (Hardiman, 1989)। দাতাও যেমন বিভিন্ন কাজ দিয়ে গ্রহীতাকে সাহায্য করে তেমনি গ্রহীতাও দাতাকে তার কাজের মাধ্যমে প্রতিদান দেয়। এর মাধ্যমে দাতা বিচারে গ্রহীতার পক্ষে রায় দিয়ে তাকে সাহায্য করে থাকে। প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের চেয়ে উন্নত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রায় দরিদ্র পক্ষের বিপরীতে যায়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা এখানে ভূমিকা রাখে (অ্যারেন্স এবং ব্যুরদেন, ১৯৮৫; Karim, 1990)। সালিশকারীরা পূর্বে দাতা গ্রহীতার সম্পর্কে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয়গুলো ছিল না। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে বিচার করা প্রচলিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (Alim & Ali, 2007)। যেহেতু সালিশকারীর কোন জবাবদিহিতার বিষয় থাকে না ও তারা গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিত, স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে তারা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুয়োগ গ্রহণ করেন। এদের সাথে তাদের সহযোগী হিসেবে গ্রাম্য কিছু দালাল সংযুক্ত হয় যারা গ্রামের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। সব সালিশের ক্ষেত্রে সালিশকারীরা অর্থনৈতিক লেনদেন গ্রহণ করেন না সেক্ষেত্রে এসকল দালাল ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণীর সাথে প্রতারণা করে অর্থ আদায় করে (Karim, 1990)। এসব বিষয়ের সাথে অভিযুক্ত পক্ষের সালিসে না আসাও বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সালিসে ক্ষতিগ্রস্থ ও অভিযুক্ত উভয় শ্রেণীর উপস্থিতি থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ভাবে অসম পক্ষ হলে ধনী পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে যা বিচারে বাধা তৈরি করে। এ দেশে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। দেশের অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন ধর্মকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ সালিশে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ফতোয়া। কোন জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধর্মীয় গ্রন্থে কি বলা আছে তা ইমাম, মৌলভীদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করলে তারা যে ব্যাখ্যা দেন তাই ফতোয়া। সালিশে ধর্মীয় বিষয় উপস্থাপিত হলে ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ফতোয়া প্রদান করেন। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়মকানুন না মেনে প্রভাবশালীদের পক্ষে ফতোয়া প্রদানের মত ঘটনা ঘটে। সমাজে শ্রেণি শোষণের পাশে নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে (অ্যারেন্স এবং ব্যুরদেন, ১৯৮৫)। অনেক সময় কোন নারী সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও নারী হওয়ার কারণে তিন স্তরের বৈষম্যের কবলে পড়েন (কামাল এবং কিবরিয়া, ২০০৩)। সাধারনত সালিশে নারীদের তেমন উপস্থিতি থাকে না। তাদের

অভিযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ করা হলেই শুধুমাত্র তারা সালিশে আসেন। নারীর মতামত, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয়। কেননা গ্রামীণ সালিশে পুরুষের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া সালিশের রায় না মানলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নেই। রাষ্ট্রীয় আইন না মানলে পুলিশ, জেলখানার মত যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে সালিশে তা নেই বলে এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক।

আনুষ্ঠানিক বিচারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের সকল জনগণ সংবিধান অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক সালিশ ব্যবস্থার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক আদালতে বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়। কোন ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা অন্যকোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তিনি ক্ষতিপূরণ বা সংবিধান অনুযায়ী বিচার চাইতে পারেন। আইনের শাসন সবার জন্য সমান করতে ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক বিচার তিনটি স্তরে রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট যা আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নামে দুই ভাগে বিভক্ত, জেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত ও গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম আদালত। জেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালতে চাপ কমানোর জন্য গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় যা সালিশ পদ্ধতিতে কাজ করে। যেসব ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি হয় না বা নিষ্পত্তি যোগ্য না সে বিষয়ের বিচার হয় নিম্ন আদালতে। সদর পর্যায়ের বিভিন্ন বিরোধের জন্যও এ আদালত কাজ করে। নিম্ন আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ও আরও কিছু আনুষঙ্গিক কাজের জন্য গঠিত হয় সুপ্রীম কোর্ট। এদেশে ধনী বা প্রভাবশালীরা বিচার প্রাপ্তির প্রথম ধাপ হিসেবে আনুষ্ঠানিক বিচারের দ্বারস্থ হয়। গ্রামীণ জনগণ অনানুষ্ঠানিক বিচারে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। তবে প্রতিকার না পেলে তখন তারা আনুষ্ঠানিক বিচারের শরণাপন্ন হয়। জবাবদিহিতার অভাব ও স্বচ্ছতা থাকেনা বলে সালিশকারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রায় দেয় আর গ্রামের জনগণ তখন আনুষ্ঠানিক বিচার চায়। সালিশকারীদের সালিশ না করার প্রবণতা থেকেও নিম্ন আদালতে বিচার প্রার্থীরা হাজির হয়। অনেকক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সালিশে না আসলে, রায় ন্যায়বিচার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত না হলে বা আংশিক ভাবে বাস্তবায়িত হলে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে দালালদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে গ্রামীণ সালিশ না মেনে অনেকে আদালতে আসে। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগণ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। বিচার প্রার্থীদের জন্য কোন সহায়ক তথ্য কেন্দ্র থাকে না। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের কবলে পড়েন যারা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষতি করেন। আইনজীবীদের অসহযোগী মনোভাবও প্রতিবন্ধকতার কারণ। গ্রামের সাধারণ মানুষ ভাবেন আইনজীবীরা তাদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দিবেন। তাই তারা আইনজীবীদের উপর নির্ভর করেন। দরিদ্র জনগণের অসহায় অবস্থাকে পুঁজি করে অনেক আইনজীবী প্রতারণা করেন (Aliran, 2003)। বিচারপ্রার্থীদের অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ করে সেভাবে তাদের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিচারপ্রার্থীদের মানসিক ভাবে হয়রানি, আদালতে না বসলেও ফি নেয়া, বা অতিরিক্ত ফি নেয়া, ডিক্রি তুলে দিতে কিংবা জামিন পাইয়ে দিতে সহযোগিতা না করার মত বিষয়গুলো আইনজীবীরা করে থাকেন (রাগিব, ২০০৭)। এছাড়াও বিভিন্ন নীতি গর্হিত কাজ তারা করে থাকে বিচার প্রার্থীদের হয়রানি করতে। একই সাথে বিচার কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মচারীদের দ্বারাও হয়রানীর শিকার হতে হয়। আদালতে নিয়োজিত পেশকার, সেরেস্তাদার, নাজির, পিয়ন, জারিকারক বা নকলবিদদের মাধ্যমেও হররানি হতে হয় (রায়, ২০০৮ক)। সব শ্রেণীর দেওয়ানি, পারিবারিক, আরবিটেশন, দেওয়ানি আপিল ইত্যাদি মামলার ক্ষেত্রে বিবাদীকে মোকদ্দমার বিষয়বস্তু জানানোর জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে সমন দেয়া হয়। বাদী বা বিবাদী উভয় পক্ষের কাছ থেকে সমনজারিকারক অর্থ আদায় করেন (রায়, ২০০৮ খ)। এদের পাশাপাশি পিয়ন, সেরেস্তাদারদের মত আদালতের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও অনেকক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি করে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলাও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বড় বাধা। আদালতে রজুকৃত মামলার রায় পেতে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। এক গবেষণায় এক একটি মামলার রায় পেতে গড়ে ৯ বছর করে সময় লাগে বলে উল্লেখ করা হয় (কর্মকার, ২০০৪)। ফৌজদারি মামলার চেয়ে দেওয়ানি মামলাগুলোতে অনেক বেশি সময় লাগে। যেখানে ফৌজদারী মামলায় সময় লাগে ৬ মাস থেকে দুই বছর সেখানে দেওয়ানির ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্তও সময় লাগে (Alim, 2004)। আদালতের কর্মচারীদের অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, আইনজীবীদের মামলা দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা, সময়মত আদালত না বসা, নতুন বিচারকদের সদিচ্ছার অভাব, বিচারক বদলি হওয়া, বিচারকদের দায়সারা মনোভাব ও প্রতিপক্ষের কূটকৌশলের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যাহত হয়। এর সাথে পুলিশের নির্যাতন ও হয়রানির কারণেও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণ আনুষ্ঠানিক বিচারে ভরসা রাখতে পারে না। পুলিশ প্রশাসন থেকে আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনমূলক আচরণের কারণে অনেকে বিচারপ্রার্থী হতে ভয় পান। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালি দেয়ার মত মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে (পান্না, ২০০৮)। একই সাথে সাক্ষীর অসহযোগিতা ও সাক্ষ্যদানের বিভিন্ন জটিলতাও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে জটিলতা, সবার জন্য একই জামিন পদ্ধতি বহাল থাকাও বিচার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলোতে দরিদ্রদের জন্য বিনা মূল্যে

আইনী সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকলেও আমাদের দেশে তেমন সুযোগ নেই (চৌধুরী, ২০০৬)। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় গরীব মানুষের আদালতের মাধ্যমে ন্যায় বিচার পাওয়ার বিষয়টি ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য (সিরাজী, ২০০৮)। তাদেরকে আইনি সহায়তা দেয়ার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সরকারি নোটিফিকেশন জারি করে প্রতিটি জেলায় জেলা ও দায়রা জজকে সভাপতি করে 'লিগ্যাল এইড কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালে আরেকটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 'জাতীয় লিগ্যাল এইড কমিটি' ও জেলা কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০০ সালে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পাশ হয় 'আইনি সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০'। এর ভিত্তিতে গঠিত হয় জাতীয় আইনি সহায়তা প্রদান সংস্থা (রায়, ২০০৭)। তবে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ ধরণের সহায়তা পেতে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হন। এসব সংস্থার সদস্যদের কাছে দরিদ্ররা যেমন যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না তেমনি আবার এসব সংস্থার কার্যক্রম সংক্রান্ত জটিলতাও বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি করে। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা এসব মামলা পরিচালনার যে খরচ তা গ্রামের দরিদ্র জনগণের পক্ষে দেয়া অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালত

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ। স্থানীয় জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রাম পর্যায়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা, বিরোধ নিষ্পত্তিতেও কাজ করে। আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরের ইউনিট হলো গ্রাম আদালত। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কিছু বিরোধ ও বিবাদের সহজ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালত গঠন করা হয়। নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সহায়তায় গ্রাম আদালত গঠন করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এর লক্ষ্য। এটি কোন নতুন ধারণা নয়। তবে এটি এমন এক আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি যার মধ্যে কিছু অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটিকে আধা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিও বলা হয় (Alim & Ali, 2007)। এ ব্যবস্থায় সভাপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ও মেম্বার, চেয়ারম্যানরা তাকে সাহায্য করে থাকে। 'গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এবং ১৯৭৯ সালের বিরোধ নিষ্পত্তি অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম এলাকায় 'দেওয়ানি বিরোধ' ও কিছু 'ফৌজদারি বিরোধ' নিষ্পত্তি করতে পারে।

সালিশি আদালত ১৯৬১ এর ২০ ধারার স্থানে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ (এলএক্সআই, ১৯৭৬) ঘোষিত হয়। যা ছিল মূলত কিছু সংশোধনীসহ সালিশি আদালতের একটি পুনর্বিচারকৃত ভাষ্য। এটি দেশে প্রথম বারের মত গ্রামাঞ্চলের একটি আইন সম্মত আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। যাকে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতাসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিক, ক্ষমতাশীল বিচার বিভাগীয় ইউনিট হিসেবে ধরা হয় (খুদা, ২০২২)। এ আদালত গ্রাম আদালত আইন অনুসারে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা মূল্যমানের দেওয়ানি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারবে বলা হয়েছিল (Alim, 2004)। ২০০৬ সালের মে মাসে ১৯ নম্বর আইনের অধীনে ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যে আইনটি প্রণীত হয় তা কম বেশি আগের আইনের মতই। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ আদালতের বিচারিক কার্যক্রম মামলার ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকার মূল্যমানের মামলা পরিচালিত হয়। পাঁচজন জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আবেদনকারী পক্ষের দু'জন প্রতিনিধি ও বিবাদী পক্ষের দু'জন প্রতিনিধি নিয়ে এ আদালত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে (একজন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার অপরজন গণ্যমান্য ব্যক্তি)। যেসব বিচারে সালিশের মাধ্যমে প্রতিকার তৈরি হয়না বা সালিশে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার তখন ইউনিয়ন পরিষদে দ্বারস্থ হয় তখন তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের ব্যবস্থা করেন চেয়ারম্যান। এটি সালিশের মতই একটি নির্ধারিত তারিখে বিচার আয়োজন করা হয়। চৌকিদারের মাধ্যমে অভিযুক্ত পক্ষকে তলব করে বিচারে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদের চত্বরে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিসহ মেম্বার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। সকল বয়সী লোকজন উপস্থিত থাকতে পারে। আবেদনকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট গ্রামে গিয়ে তারা বিচার করে থাকেন। সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে এ আদালত চূড়ান্ত রায় প্রদান করেন। রায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ মেনে নেয় অথবা না মেনে নিলে তারা সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রদান করবে বললেও তারা অনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত করে। গ্রাম আদালত সংশোধন আইন, ২০২৪ অনুসারে এ আদালত বর্তমানে তিন লাখ টাকা মূল্যমানের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য ফৌজদারী অপরাধগুলো হলো স্বেচ্ছায় আঘাত করা, ক্ষতি সাধন, অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, বেআইনি সমাবেশে যোগদান, দাঙ্গা, কলহ বা মারামারি, অন্যায়ভাবে আটক, মারাত্মক প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ, অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন, চুরি, প্রতারণা, অসাধুভাবে কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাৎ। আর দেওয়ানি অপরাধের মধ্যে আছে কোন চুক্তি, রশিদ বা

দলিল মূল্যে প্রাপ্য টাকা আদায়, অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার, স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার, গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ। এ আদালতে ফৌজদারি মামলা ৩০ দিনের মধ্যে ও দেওয়ানি মামলা ৬০ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হয়। শুনানি কার্যক্রম শুরুর ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হয়। অতিরিক্ত ৩০ দিন সময় সীমার পর গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় (আসাদুজ্জামান, ২০২৪)।

গ্রামীণ বিচারিক প্রক্রিয়া গতিশীল করতে করনীয়

দেশের নাগরিক সমাজ গ্রামীণ জনগণের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে অবদান রাখতে পারে। গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ও এর সুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে বিচার কাজ পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা যায়। বিচারকাজে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান করা প্রয়োজন। সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের জনগণ, বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র গ্রাম আদালত কার্যকর করতে কিছু বিষয় বাস্তবায়নে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটির সুপারিশের আলোকে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম নিবিড় ভাবে মূল্যায়ন, বিচারিক এখতিয়ার বৃদ্ধি, বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব, বিচারিক ক্ষমতা ও রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া গ্রাম আদালত আইন ইউনিয়ন পর্যায়ে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, মামলা নিবন্ধনের জন্য ফি বৃদ্ধি করা, অবকাঠামা স্থাপন, লোকবল ও উপকরণ সরবরাহ, আদালত পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মানীর ব্যবস্থা করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাও অত্যাবশ্যক। রায় বাস্তবায়নে গ্রাম আদালতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে (খুদা, ২০২২)। আদালতগুলোতে মামলার জট কমানো বর্তমান বিচার ব্যবস্থার একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। অসংখ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিচার প্রাপ্তি সহজে নিশ্চিত করতে এবং মামলা জট কমাতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরী। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রাম আদালত কার্যকর হলে গ্রামীণ জনগণ অল্প সময়ে, কম খরচে ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে।

গবেষণার প্রায়োগিক দিক

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গিয়ে সালিশকারীদের অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণে যে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত আসে বা তাদের স্বজনপ্রীতি অথবা ফতোয়ার কারণে যখন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখন হয় তখন তাদেরকে আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির বিধান করতে হবে। গ্রাম আদালতকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখে চেয়ারম্যান, মেম্বার বা জনপ্রতিনিধিরা যাতে কোন পক্ষপাতমূলক বিচার পরিচালনা না করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে জেলা পর্যায়ের আদালত ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত বিচারক নিয়োগ দিতে দ্রুতগতিতে মামলার রায় দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি গ্রামীণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা তৈরি করে তা আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। কিছু বিষয় গ্রাম আদালতের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধিমালার অধিভূক্ত বিধিমালার আইনগুলো সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জানা ও বোঝার ঘাটতি থাকে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর আদালত বা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পর্যালোচনা বা পরিবীক্ষণ যথাযথ নয় এবং গ্রাম আদালতের রায় বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া মামলা নিবন্ধনের জন্য দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে ফি এর পরিমান খুবই কম যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক উপকরণের ব্যয়ের অংশ বিশেষও মেটানো সম্ভব হয়না। গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপকরণ সরবরাহেরও ব্যবস্থাও তেমন নেই। একই সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য কোন সম্মানি বা বেতন-ভাতাও নেই।

বর্তমানে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০২৪ এ আর্থিক জরিমানা বাড়ার পাশাপাশি অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা তার মূল্য আদায়, স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হলে দখল উদ্ধার বা অস্থাবর সম্পত্তি জবরদখল বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ বলবৎ রয়েছে। এ আইনের ৮ ও ৯ ধারায় গ্রাম আদালতের বিদ্যমান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক মামলার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার ও ব্যাখ্যা দেয়া আছে। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এ আর্থিক এখতিয়ার

উল্লেখ না থাকলেও এ আইনে বিচার পাওয়ার জন্য বিচারিক কাঠামো রয়েছে। কিন্তু গ্রাম আদালতে তিন লাখ টাকা আর্থিক এখতিয়ার সে ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে। কেননা বিভিন্ন মৌজায় জমির দাম ৩ লাখ টাকা বিঘা কিন্তু বাজার মূল্য বেশি। গ্রাম আদালত আইনের ধারা ৩৩ (১) অনুসারে, মামলার অভিযোগ শুনানির সময় কোন আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটি গ্রাম আদালতে বিচার্য তা হলে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলাটি গ্রাম আদালতে প্রেরণ করতে পারবেন। তবে প্রশ্ন হলো ৩ লাখ টাকার মামলা গ্রাম আদালতে পাঠালে সুষ্ঠু বিচারের সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে বা বিচারিক আদালতের ভূমিকাই বা কি হবে। কেননা ২০২১ সালের আগেও একজন সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার ২ লাখ টাকা ছিল। সেখানে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে একজন আধাবিচারিক আদালতের চেয়ার্ম্যানকে ৩ লাখ টাকা আর্থিক এখতিয়ার দেয়া কতটা ফলপ্রসু তা বিবেচ্য বিষয়। ২০২৪ সালের পবরর্তী সময়ে গ্রাম আদালত গ্রামীণ জনগণকে কতটা আইনি সেবা দিতে পারবে সেটিই প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ এ আদালতকে আধাবিচারিক সংস্থা বলা হলেও এর আইন প্রয়োগ, ক্ষমতা এখতিয়ার আদালতের সমতুল্য। তবে গ্রাম আদালতের বিচার্য অপরাধগুলো নিয়মিত আদালতে গেলে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও মামলাজট তৈরি হবে। দ্রুত বিচারের জন্য গ্রাম আদালতের বিচারক নিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায়ে সুবিচার নিশ্চিত হবে, তেমনি গ্রামের মানুষের মাঝে আইন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে বিদ্যমান গ্রাম আদালতের কাঠামোতে বাদী-বিবাদী, ইউপি সদস্যের পাশাপাশি উকিল নিয়াগ দেওয়ার বিধান চালু করলেও বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা যায়। গ্রাম আদালত কার্যকর হলে স্থানীয় বিচারব্যবস্থায় নানান ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। গ্রামীণ জনগণ দরিদ্র ও নারীরা কম খরচে ও কম সময়ে ন্যায়বিচার পাবে। আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার তুলনায় এ আদালতের বিচার পদ্ধতি ও বিচার ব্যবস্থা বন্ধুসুলভ বলে বিবাদমান পক্ষগুলোর সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। যারা বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন তারা স্থানীয় বলে রায় বাস্তবায়নে সহজ হয়। গ্রাম আদালতের প্রদেয় রায়ের আইনগত ভিত্তি থাকার কারণে এ রায় উচ্চ আদালতেও গ্রহণযোগ্য হয়। নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ নিশ্চিত হলে বর্তমানে বিচারাধীন অনেক মামলা স্থানীয়ভাবে মীমাংসিত হবে। তাই গ্রাম আদালত আইন সংশোধন নয়; সম্পূর্ণ ভাবে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন, যাতে গ্রামীণ পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিতের সাথে বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে বিদ্যমান মামলার জট কমানো সম্ভব হয়।

উপসংহার

সালিশ ব্যবস্থা হতে আদালতের বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রামীণ জনসাধারণ বিভিন্ন ধরণের হয়রানির শিকার হন। এর মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছল অবস্থা, সালিশকারীদের অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রবণতা ও স্বজনপ্রীতি, মধ্যবর্তী সমঝোতাকারীদের প্রতারণা, লিঙ্গীয় বৈষম্য, ফতোয়ার প্রভাব, অভিযুক্ত পক্ষের সালিশে না আসার প্রবণতা ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় তারা যেসব সমস্যার সম্মুখিন হন তা হলো, বিচারপ্রার্থীদের জন্য সহায়ক কোন তথ্যকেন্দ্র না থাকা, আদালত প্রাঙ্গণে দালালদের হয়রানি, আইনজীবীদের অসহযোগী মনোভাব, মানসিকভাবে হয়রানি করা, আদালত না বসলেও ফি নেয়া, ডিক্রি তুলে দিতে অসহযোগিতা, নীতি গর্হিত কাজ করা, আদালতের কর্মচারীদের দ্বারা হয়রানি, সময়মত আদালত না বসা, নতুন বিচারকদের সদিচ্ছার অভাব ও বদলি, পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানি, সাক্ষী ও সাক্ষ্যদানে জটিলতা, জামিন পদ্ধতির জটিলতা, আইন সহায়তা কমিটির নীতিগত দূর্বলতা, বিচারকদের দায়সারা ভাবে কাজ করার মানসিকতা ইত্যাদি। অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাকেই গ্রামীণ জনগণ ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করে। আর চূড়ান্ত উদ্যোগ হিসেবে তারা আদালতে হাজির হন। সালিশ এর মাধ্যমে প্রতিকার না পেয়ে আদালতে এসেও বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হন গ্রামীণ গনগণ। যা তাদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে। অনেকক্ষেত্রে নিজের পক্ষে রায় পেলেও ন্যায়বিচার পাওয়ার ধারণার সাথে রায়ের অসঙ্গতি লক্ষ্যনীয়। কেননা প্রচুর অর্থ ও দীর্ঘসময় ব্যয় করে কাঙ্খিত ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব হয় না। সব কিছু মিলিয়ে গ্রামীণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ধারণাটি অনেকটাই অনিশ্চিত। দেশের বিচার বিভাগের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে প্রচলিত আইনগুলোকে সময় উপযোগী করে সংস্কার করতে হবে। গ্রামীণ জণগনের মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

References

আসাদুজ্জামান, মোঃ (২০২৪) গ্রাম আদালত সংশোধনে একটি প্রস্তাব, দৈনিক সমকাল, ৯জুন, ঢাকা। Retrieved from: https://samakal.com/opinion/article/241488/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC . (Accessed On 03-06-2025)

কর্মকার, অরুণ (২০০৪) ৩২ লাখ মামলায় আদালত সয়লাব, উন্মোচন, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ.৬, ঢাকা: নাগরিক উদ্যোগ।

কামাল, সুলতানা (১৯৯৪) প্রসঙ্গ: সমাজ ও আইন, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-৬৪, পৃ.৮২-৮৮।

কামাল, মেসবাহ এবং কিবরিয়া, আরিফাতুল (২০০৩) বিপন্ন ভূমিজ: অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ-বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের প্রতিচিত্র, ঢাকা: গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ।

চৌধুরী, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (২০০৬) আইনগত সহায়তা, ডিটেকটিভ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা।

পান্না, শাহ আফ্রোদিতি (২০০৮) অন্যায় গ্রেফতার ও আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা: আসল আসামির পরিবর্তে খুনের মামলায় প্রায় ৩ বছর জেল খেটেছেন নিরপাধ জাহাঙ্গীর, বুলেটিন, ডিসেম্বর, পৃ.৯-১০: আইন ও সালিশ কেন্দ্র।

ব্যুয়ারদেন ফন, অ্যারেন্স, জেনেক এবং জোসেফ (১৯৮৫) ঝগড়াপুর: গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী, ঢাকা: গণ প্রকাশনী (নিলুফার মতিন অনূদিত)।

খুদা কুদরত ই, বাবু (২০২২) বিচারপ্রাপ্তি সহজ করবে গ্রাম আদালত, কালের কণ্ঠ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা। Retrieved from: https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2022/02/21/1122277 (Accessed On 18-05-2025)

মহিউদ্দিন, কে. এম. (১৯৯৯) গ্রামীণ সালিশে দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ: এনজিও-র ভূমিকা পর্যালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-৭৩, পৃ.৮২-৯৯।

রহমান, আতিউর (১৯৮৬) গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোর রূপান্তর; মাতবরদের অবস্থা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা- ৩২।

রায়, পলাশ কুমার (২০০৭) দরিদ্র বিচারপ্রার্থীরা আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত, প্রথম আলো, ০২ ডিসেম্বর, বর্ষ-১০, সংখ্যা ২৯, ঢাকা। Retrieved from: http://www.prothom-alo.com/archive/news_details_fcat.php?dt=2007-12-02&issue_id=446&cat_id=&nid=MTY5NjI=&fid=OA

রায়, পলাশ কুমার (২০০৮ ক) আদালত পাড়ায় প্রতারক চক্রের দৌরাত্ম্য, প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর, বর্ষ ১০ সংখ্যা ৩৩৯, ঢাকা। Retrieved from: http://www.prothom-alo.com/archive/news_details_fcat.php?dt=2008-10-19&issue_id=1076&cat_id=&nid=MzEIMDY=&fid=OA .

রায়, পলাশ কুমার (২০০৮খ) সমন জারিকারকদের দৌরাত্ম্য, প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল, বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৫৭, ঢাকা। Retrieved from: http://www.prothom-alo.com/archive/news_details_fcat.php?dt=2008-04-13&issue_id=893&cat_id=&nid+MjI3MTU=&fid=OA

রাগিব, আফতাব উদ্দিন ছিদ্দিকী (২০০৭) পেশকারদের দৌরাত্ম্যের শেষ নেই, প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর, বর্ষ-১০, সংখ্যা-১৫, ঢাকা। Retrieved from: http://www.prothom-alo.com/archive/news_details_fact.php?dt=2007-11-18&issue_id=432&cat_id=&nid=MTYzMDE=&fid=OA

সিরাজী, শাহিন আহমেদ (২০০৮) বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা, প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৬৭, ঢাকা। Retrieved from: http://www.prothomalo-alo.com/archive/news_details_fact.php?dt=2008-01-13&issue_id=802&cat_id=&nid=MTg0NTU=&fid=OA

Alim, M. A. (2004) Salish and the Role of BRAC's Federation: Improving the Poor's Access to Justice. Retrieved from: https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2021/11/Shalish-and-the-Role-of-BRACs-Federation-Improving-the-Poors-Access-to-Justice.pdf (Accessed On 02-06-2025)

Alim, M. Abdul & Ali, Tariq Omar (2007) NGO-Salish and Justice Seeking Behaviour in Rural Bangladesh. Dhaka: BRAC Research and Evaluation Division. Retrieved from: https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2007/11/NGO-Shalish-and-Justice-Seeking-Behaviour-in-Rural-Bangladesh.pdf (Accessed On 19-05-2025)

Aliran Monthly (2003) Will the Poor Get Justice From the Courts? Lessons from the Ladang Bukit Jelutong Worker's Experience. Aliran Monthly, Issue-7. Retrieved from: http://www.aliran.com/oldsite/monthly/2003/7b.html . (Accessed On 05-06-2025)

Akand, Mustafa Kamal (2003) The Salish and Social Cohesion in Bangladesh Village: A Case Study. South Asian Anthropologist. 3(2): 163-176.

Anderson, M. (2003) Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive to poor people in LDC's. IDS Working Paper, 178, 2003. Retrieved from: http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp178.pdf (Accessed On 19-05-2025)

Golub, Stephen (2003) Non-state Justice Systems in Bangladesh and the Philippines: Paper Presented for the United Kingdom Department for International Development. UK (DFID): London. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTJUSFORPOOR/Resources/GolubNonStateJusticeSystems.pdf (Accessed On 02-06-2025)

Hardiman, David (1989) The Indian 'Faction': A Political Theory Examined. Subaltern Studies I Ranajit Guha (ed.) p.198-231. New Delhi: Oxford University Press.

Hasle, Lena (2003) Too Poor for Rights? Access to Justice for Poor Women in Bangladesh: A Case Study. MSC Human Rights, The Bangladesh Development Studies, 29(2/3): 99-136.

Jahan, Ferdous (Undated) From Rule of Law to Legal Empowerment of the Poor in Bangladesh: Towards and Agenda for Changes. Retrieved from: http://www.undp.org/legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Country%20Files/4_Bangladesh/4_3_Access_to_Justice.pdf (Accessed On 02-06-2025)

Jansen, E.G. (1986) Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources, P.32, Norway: Norwegian University Press.

Karim, A.H.M. Zehadul (1990) The Pttern of Rural Leadership in a Agrarian Society- Case study of the Changing Power Structure in Bangladesh, New Delhi: Northern Book Centre.

Siddiqi, M. Dina (2003) Paving the way to Justice: The Experience of Nagorik Uddyog, Bangladesh. One Word Action: London. Retrieved from: https://iknowpolitics.org/sites/default/files/pavingtheway_owaction.pdf (Accessed On 01-06-2025)